# মেঘ ও চড়াই

**অরুন্ধতী ভট্টাচার্য্য**

এক - একটা দিন গালে বারবার মাছি বসার মতোই বিরক্তিকর, অন্তত: কাকভোর থেকে চড়াইয়ের তাই মনে হচ্ছে। বিরক্তির অনেকগুলো কারণ আছে — এতগুলো কারণ, যে গুনতেও ইচ্ছে করছে না চড়ায়ের। কালরাত থেকেই মা তার চিরপরিচিত কঠোর ব্যক্তিত্বে বেশ পিলে চমকানো গোছের চাউনি দিচ্ছে বারবার। মার এই মূর্তির সামনে দাদা পর্যন্ত কেঁচো হয়ে যায়; আর চড়াই তো কোন ছার! বিরক্তিটা এখানেই— চড়াই এত ভয় পায় কেন? সবকিছুকেই তার ভয় পেতে হবে। একলা চড়াই নিজেকে ঠাইঠাই করে চড় মারে— ভীষণরকম সাহসী কথা বলে নিজের ভেতরের ওই অচেনা ভয়টাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়, কিন্তু কাজের বেলা অন্তরম্ভা। এ নিয়ে বন্ধুদের কম ঠাট্টা সহ্য করে না চড়াই। তাই এখন আর বন্ধু ভাবতেই ইচ্ছে করে না কাউকে।

আজ তাকে কলেজে যেতেই হবে। ফাইনাল ইয়ার, ক্লাস মিস্ করা চলবে না। তাছাড়া ডিজি আজ ক্লাস শেষের পরে সাজেশান দেবেন বলেছেন। আর একটা ঘটনা ঘটবে না কি আজ— একজন নতুন লেকচারার আসছেন, তাঁরই প্রথম ক্লাস এগারোটা থেকে। ওদের সবচেয়ে কঠিন টপিকটাই উনি পড়াবেন। পরীক্ষার আগে এই বিষয়গুলো যে ভীষণ দরকারি হয়ে উঠে সেটা মা বুঝবে না — আর যে সব বুঝত তাকে চড়াই সব সমস্যা বলবে। কিন্তু উত্তর আসবে না। খামোখা আরো মন খারাপ হয়ে যাবে। মার আজকে রাগের কারণটা খুব স্পষ্ট ছিল না চড়াই - এর কাছে, দাদা ছবির মতো স্বচ্ছ করে দিয়েছে। নিযোগী কাকুর ঘনঘন এ বাড়িতে আগমনে একটু অবাক হয়েছিল চড়াই। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে এতবড়ো ষড়যন্ত্র চলছে তা তার বুঝতে দাদার সাহায্য নিতে হয়েছে। আর কিছুই নয়, আর পাঁচটা বাঙালি ঘরের মেয়েদের মতোই বয়স থাকতে থাকতে বিয়ের তোড়জোড়। তাই বলে এত তাড়াতাড়ি। নিয়োগীর ওই ট্যাঁকশাল ট্যাঁড়স ছেলেটাকে কিছুতেই বিয়ে করবে না চড়াই— এখন তো নয়ই, কখনোই নয়। কিন্তু এসবই তার স্বগতোক্তি! চড়াই ভেবে পায় না, মা এত শিক্ষিত আধুনিক মনস্কা হয়েও কিভাবে চড়াইয়ের বেলাতেই এই সিদ্ধান্তটা নিতে পারল। তার কারণ কি হতে পারে? হঠাৎ একটা খুব বিচ্ছিরি কথা চড়াই - এর মনে হলো— মা কি চড়াই -এর জন্য ভয় পায় — যদি চড়াই একটা আচমকা ভুল করে ফেলে! এই ভুলের সংজ্ঞাটা মা তার নিজের বিয়ে দিয়ে ব্যাখ্যা করে?— না কি... মার কাছে চড়াই আসা মানেই আরেকজন মানুষও মিলেমিশে এসে যায়— বাবা! চড়াই জানে যে প্রায় পুরোটাই বাবার মতো। মা আজও বাবাকে ক্ষমা করতে পারেনি, কিন্তু বাবারও মাকে ক্ষমা না করার অনেকগুলো কারণ ছিল। বাবা নিজের অপরাধটাই মেনে নিয়েছিলেন। প্রথম দিকে বাবা - মার ঝামেলা - ঝগড়া দেখলেও পরের দিকে বাবা কেমন যেন শান্ত হয়ে গিয়েছিল— আর মা নির্লিপ্ত। মার যন্ত্রনাটা ভীষণ গভীর, বোঝে চড়াই কিন্তু তখন সে যে ভীষণ ছোটো। পরে শুনেছে, বুঝেছে। নাঃ , কেউ তাকে আলাদা করে কিছু বলেনি — তবু বুঝেছে সে, মা তখন দাদাকে নিয়ে ব্যাঙ্গালোরে থাকে। তাদের কৃষ্ণনগরের সাবেকী পুরনো বাড়িতে সে আর বাবা। কতই বা বয়স হবে তখন তার। পাঁচ কি ছয়। আর ছিল বিশুকাকা। তাকে চোট্টোবেলা থেকে আঁকড়ে রেখেছিল। ছুটি - টুটিতে যখন মা - দাদা বাড়ি আসত তখন আনন্দের থেকে দমবন্ধ করা একটা গুমোট ভাব থমকিয়ে রাখত ছোট্ট চড়াইকে। ব্যাগে নোটলের ফাইলটা ডোকাতে ঢোকাতে ভাবছিল চড়াই। যতদিন যাচ্ছে, সে যেন অনেককিছু বুঝে যাচ্চে। অথচ বাবা বলত— ''কক্ষণো সব বুঝবি না, বুঝলি। তাহলেই তো তুই বড়ো হয়ে যাবি।''

সত্যিকথা বলতে কি চড়াই একথা মনে গেঁথে ফেলেছে, যদিও একারণে বাড়িতে এবং বাইরে তাকে নানা ব্যাঁকা কথা শুনতে হয়, যার সবগুলোর মানে বোঝার চেষ্টাও করে না সে। বিশুকাকা ঘরে ঢুকেছে। চড়াই বিশুকাকার বিখ্যাত জর্দার গন্ধ পাচ্ছে। হাতের কাজ চটপট গোছাতে গোছাতে জিজ্ঞেস করল চড়াই—

—কি ব্যাপার? তোমাকেও বকা শুনতে হয়েছে তো?

—তোমাকে হবে। দুদিন ধরে জ্বরে ভুগছ, এখনো ঠিক হয়নি বোধ হয়। তবু জেদ করবে? আজ না গেলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে শুনি?

—মহাভারত? এত বড়ো অশুদ্ধি ঘটাতে পারব না। আরে বাবা খুব দরকার না থাকলে আমি জেদ করতে পারি?

—তা, দরকারটা বৌদিকে স্পষ্ট করেই বলো— সে তো...

—তোমার বৌদির আর স্পষ্ট কথা শুনে কাজ নেই! অনেক শুনেছে।

কথাটা বলে চড়াই নিজেই চমকে গেল। সে কি সত্যিই বড়ো হয়ে যাচ্ছে?

মা কালকে বিকেল থেকেই কথা বন্ধ করেছে। চড়াই জানে প্রথমে দাদা তারপরে ও মিলে মাকে ঠাণ্ডা করে ফেলবে। কিন্তু নিয়োগীর পাত্র জ্বালাবে বলে মনে হচ্ছে— এবং সেখানে মাকে ওরা কতটা ঠাণ্ডা করতে পারবে সন্দেহ আছে। সাড়ে ছটায় ট্রেন, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। তারপর মাকে সাময়িক ঠাণ্ডা করার চেষ্টায় আরও একটু সময় পিছলে গেল। চন্দ্রনগর থেকে যাদবপুর — বইয়ের ব্যাগ ছাড়াও একটা কিটব্যাগ রয়েছে চড়াইয়ের সঙ্গে। হোস্টেলে থাকতে মন্দ লাগে না চড়াইয়ের — অনেক কিছু থেকে দূরে থাকা যায়। যদিও এত কম দূরত্বে হোস্টেল পাওয়ার কথা ছিল না চড়াইয়ের, তবু সে পেয়েছে। মায়ের জন্যই পেয়েছে। দীর্ঘ কর্মজীবনে মা বহু মানুষের উপকার করেছে— তারই সুযোগ অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাইয়ে দিয়েছে মা তাকে। মার এই সাহায্যটা লাগত না, যদি না মা কৃষ্ণনগরের বাড়ি বিক্রি করে, চন্দননগরে বাড়ি করত!

বাড়ি থেকে বেরিয়ে মোড়ের মাথায় আসতেই চড়াইয়ের মনে পড়ে গেল আজ রিক্সা স্ট্রাইক। দশমিনিটের হাঁটাপথ ছ'মিনিটে না গেলে সে ট্রেনটা মিস্ করবে। ধুর! সকাল থেকেই গন্ডগোল! ভীষণ জোরে পা চালাল চড়াই। কোনো রকমে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশানে সে চক্ষুচড়ক গাছ চড়াইয়ের। প্ল্যাটফর্মে এত লোক কেন? ট্রেনেরও ঝামেলা না কি? এক মহিলাকে প্রশ্ন করে জানল তার আশঙ্কাই ঠিক! হয়ে গেল এগারোটার ক্লাস ধরা। মিনিট চল্লিশেক অপেক্ষার পর ঘোষণা হলো ট্রেনের। অনিয়মিত ট্রেন চলাচলের কারণে ট্রেনটি অন্য প্ল্যাটফর্মে আসছে। ভীড়ের মধ্যে পা চালিয়ে ওভারব্রিজ ক্রস করতে হবে— সঙ্গে তিনমনের দুটো ব্যাগ। ওদিকের প্ল্যাটফর্মে নামতে যাওয়ার সময় ঘটল অঘটনটা— হোঁচট খেয়ে পড়ল চড়াই। পা-টা বোধহয় মুচকেছে, উঠতে গিয়ে টের পেল প্রচণ্ড ব্যথাটা। ট্রেনটা অসভ্যের মতো তখনই ঢুকেছে। লেডিস পর্যন্ত এই মচকানো পা নিয়ে তারপক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। অগত্যা জেনারেলেই নরকযন্ত্রনা নিয়ে উঠল চড়াই। কষ্ট সহ্য করার গুণটা সে বোধ হয় তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছে। বাবা কোনো কষ্ট কাউকে বুঝতেই দিত না। মা বুঝে কিছু করতে গেলে হয় হেসে উড়িয়ে দিত নয়ত চুপচাপ বসে থাকত। কিন্তু এই মুহূর্তে হাসা কিংবা চুপ করে থাকা কোনোটাই সম্ভব হচ্ছিল না চড়াইয়ের পক্ষে। টেনে - হিঁচড়ে নিজেকে ও ব্যাগগুলোকে ভেতরে নিয়ে যাবার সময় অনেকের সঙ্গেই বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হলো চড়াইকে। গলদঘর্ম হয়ে ভেতরে ঢুকল। বসার সিটের সামনেও ভীড়। কিন্তু চড়াইও মরিয়া, বহুলোককে আহত করে এবং তাদের 'অমৃতবাণী' শুনে ভেতরে ঢুকে গেল সে— জানালার ধারে। পাটা ফুলে জুতোর স্ট্র্যাপে এঁটে বসেছে। যন্ত্রনাটা সহ্যের সীমা প্রায় পার করে চলেছে। কিটব্যাগটা কেনো রকমে উপরের বাঙ্কে তুলে জানালায় হেলান দিল চড়াই। শরীরটা বেগড়বাই

সৃষ্টিসন্ধান

করছে এবং জ্বরের বাঁদরামোটা বাড়বে বলেই মনে হচ্ছে। একটু আগেই কী ভীষণ গরম লাগছিল আর, যেন ততটা লাগছে না। একটু শীত শীত করছে। জানলার ধারে বলা বুড়োটা প্রথম থেকেই কুদৃষ্টি দিচ্ছে। ''ঘাটের মড়াগুলো মরেও না কেন?'' বিড়বিড় করে বলে উঠল চড়াই। অবশ্য তাতে বুড়োর রসবোধ বিন্দুমাত্র কম হলো না। আরও আশ্চর্য তার পাশের জনটি। এই অবস্থাতেও যে মুখে স্বর্গীয় হাসি নিয়ে কেউ বসে থাকতে পারে তা জানা ছিল না চড়াইয়ের। ব্যাক্তিত্বটিকে ছেলে বললেই ঠিক হয়, 'লোক' 'লোক' ভাবটা এখনও আসেনি। সে অনাবিল হেসে চারপাশ দেখছে — যেন ভূস্বর্গ কাশ্মীর! একটু হোঁচট খেল চড়াই মনে মনে — বাবাও এরকম ভাবেই যেন চারপাশ দেখত। বাবা বেশ অদ্ভুত ছিল। খাম - খেয়ালী, আপন ভোলা গোছের! শেষের দিকে তো বাবাকে দেখে তার মনে হতো যেন অন্য জগতে বাস করছে। চড়াই তখন ক্লাস এইটে, রাতে বাবার শরীর খারাপ হলো— যে শ্বাসকষ্ট আর লুকোতে পারেনি বাবা। মা-কে ফোন করে সে বাবার হাত ধরে বসে। বিশুকাকা পাগলের মতো ডাক্তার খুঁজছে। তবে বেশীক্ষণ ছোটাছুটি করতে হয়নি— তার মধ্যেই সব শেষ! বাবা তার হাতটা ধরতে পেরেছিল। বলেছিল একটা অদ্ভুত কথা— 'মেঘের কাছে যাচ্ছি রে!' স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল চারপাশ।

এই যে মামনি, একটু জায়গা দাও তো, নামব! বুড়োটার টাকে ডজনখানেক গাঁট্টা মারলেও কম হয! অসভ্যের মতো তার গা ঘেঁষে বেরোল শয়তানটা। চড়াইয়ের মুখ দিয়ে বেরিয়েই গেল— 'বদবুড়ো'।

তবু ভালো, লটারির টিকিটের মতো জানলার ধারে জায়গা পেয়ে গেল চড়াই। কিন্তু লটারির টিকিট কাটলেই যে লটারি লাগবে তার কোনো মানে নেই! বৈদ্যবাটী স্টেশনে ট্রেন যে দাঁড়াল আর নড়ার নাম নেই। কার মুখ দেখে সে যে সকালে উঠেছিল আজ? সম্ভবত তার নিজের। পাশের ব্যক্তিত্বটি এখনও কিন্তু অবিচল। নাঃ জ্বরটা আবার এসেছে। ক্লাসের আশা অনেকক্ষণ ছেড়ে দিয়েছে চড়াই। এমন আঁটোসাঁটো হয়ে বসে আছে সব যে ব্যাগ থেকে জল আর ওষুধটা বার করাও যাচ্ছে না, তবু কোনো রকমে জলের বোতলটা টেনে বার করার সময় ডান হাতের কনুইটা পাশে ব্যক্তিত্বটির নাকে সলিড্ গোঁত্তা মারল। শুধু তাই নয়, পরিস্থিতি সামলানোর আগেই ব্যাগের খোলা চেন থেকে খাতাপত্র ট্রেনের জমিতে! এত অপ্রস্তুত যে আগে কখনও হয়নি।

—আগে জিনিসগুলো তুলুন, ব্যাগটা স্বচ্ছন্দে আমাকে ধরতে দিতে পারেন।

লজ্জায় ও নিজের ওপর রাগে কোনো কথাই বলতে পারল না চড়াই। ছড়ানো জিনিসগুলো তুলে ব্যাগটায় ভরে চেনটা আটকে দিল! খুব আস্তে আস্তে বলল—

—ধন্যবাদ! আমি, মানে... ঠিক ইচ্ছে করে...

—জানি তো! ইচ্ছে করে আপনি আপনার 'বদবুড়ো' কে এই গুঁতোটা মারতে চেয়েছিলেন। আমায় নয়।

ওমা। শুনে ফেলেছে। ছোঁড়ার কান বেশ ভালো তো। যদিও বদবুড়ো কথাটা একেবারেই পছন্দ হলো না চড়াইয়ের। ব্যাগের সাইড পকেট থেকে ওষুধ বার করতে যাবে চড়াই তখনই পাশের ব্যক্তিত্ব বলে উঠল—

—এবার একটু সাধধানে কেমন? চোখের সরষে ফুলগুলো এখনও উধাও হয়নি, তার ওপর যদি আরেকটা খাই...

—আমি নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে মারিনি।

—আমি তো তা বলিনি। তবে বিপদ একা আসে না তো, তা-ই একটু সাবধানে থাকছিলাম আর কি।

কান মাথা ঝাঁ ঝা করছিল চড়াইয়ের। কথা না বাড়িয়ে ওষুধটা খেয়ে নিল চড়াই। পাশের ব্যক্তিত্ব যদিও খুব হাস্যকর ভঙ্গিতে নাকটা ধরে রয়েছে। তবুও হাসি পেল না চড়াইয়ের। ওরকম অদ্ভুতভাবে নাকটা ধরেও মুখের হাসিটি অনাবিল রেখে বসে আছ সে। হঠাৎ চড়াই-এর দিকে ফিরে বলল— খুব অসুবিধা না হলে এবার একটু আমার ব্যাগটা ধরবেন?

—দিন।

ওমা! ও ছোঁড়াটাও নিচু হয়ে কি যেন করছে। জুতোর ফিতে খুলে গেছে বোধ হয়, বাঁধছে। চড়াই আবার জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘাড় এলিয়ে দিল। আজ যেন বাবার কথা বড্ডবেশি মনে পড়ছে। রোজই পড়ে, আজ যেন ভীষণ বেশী মনে পড়ছে। চড়াই জানে বাবা মারাত্মক ভুল করেছিল , অন্যায় করেছিল মার সঙ্গে, তবু বাবাকে সে কিছুতেই খারাপ ভাবতে পারে না— পারবেও না, কারণ বাবা নিজের অন্যায়ের জন্য কাউকে দায়ী করেনি, নিজেকে ছাড়া। খুব ভালোভাবে বিচার করলে দায়ী কিছুটা মা-ও ছিল— শ্রুতি রায়ও কম দায়ী ছিল না। কিভাবে যে বাবার সঙ্গে শ্রুতি রায়ের সম্পর্ক তৈরী হল জানে না চড়াই। মার অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্খা বাবার সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল অনেকদিন। তবু তো দুটো মানুষ একসঙ্গে থাক। কিন্তু শুধুমাত্র অ্যাম্বিশানের জন্য মার ব্যাঙ্গালোরে চলে যাওয়াটা বোধহয় বাবা কোনো দিনই মেনে নিতে পারেনি। তার ওপর দাদাকেও মা সঙ্গে নিয়ে গেল। তাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল, বাবার জেদের কাছে ওখানে হেরে গিয়েছিল মা। যুক্তি বলে, বাবা শূন্যতা ঢাকতে শ্রুতি রায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল। পাল্টা যুক্তি বলে, সেটা কোনো কথাই নয়— জেদ করে মেয়েটাকে যে নিজের কাছে রাখল বাবা, শূন্যতা তা দিয়ে পূরণ হয় না? হয়ত সব শূন্যতা এভাবে পূরণ হয় না। তাই বলে এই বিশ্বাসঘাতকতাকে ক্ষমা করা যায়? হয়ত যায় না। তার বাবাকে কেউ তো ক্ষমা করেও নি। চড়াই নিজেই কি পেরেছে? তারও তো অভিমান হয় বাবার ওপর — বাবা কি তাকে শুধু মার সঙ্গে ইগো ক্ল্যাশের একটা হাতিয়ার হিসেবে নিয়েছিল? সবই করত বিশুকাকু, শুধু রাতের খাওয়াটা বাবা খাইয়ে দিত। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত খাইয়ে দিয়েছিল। বাবার মুখে মদের গন্ধ আর ভাত - তরকারি, মাছ বা মাংস সব গন্ধ আর ভাত - তরি তরকারি, মাছ বা মাংস সব গন্ধ এক হয়ে যেত— সবটাই যেন বাবার গন্ধ মাখানো। বাবার সঙ্গে শ্রুতি রায়ের সম্পর্কটা এক বছরের বেশী বোধ হয় থাকেনি। কিন্তু ততদিনে অন্য সম্পর্কগুলো পচে - গলে শেষ হয়ে গেছে। বাবা ড্রিঙ্ক করত, কিন্তু দিনে দিনেই যেন সেটা বাড়তে লাগল। রাতে চড়াইকে খাওয়াবার সময় বাবা আন্দাজ পেত না, কতটা গরম সে খেতে পারবে। বাবার হাত কাঁপা শুরু হলো। চড়াই বাবার হাতটা ধরে নিজের মুখে গরাস পুরে নিত। মার যাতায়াত প্রায় বন্ধই হয়ে গেছিল। ফোন করে চড়াই - এর খোঁজ খবর নিত, বাবার শরীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত, আর ডাক্তারের ফোন নাম্বার দিয়ে রাখত। মা কি অপেক্ষা করত? বাবা কবে...। শিউরে উঠল চড়াই। কীসব জঘন্য নোংরা কথা ভাবছে সে। বোধহয় সব শেষ হয়ে ও ওরা শেষ পর্যন্ত সম্পর্কটা চেয়েছিল— এত অভিমন, এত জটিলতার মধ্যেও চেয়েছিল!

এখন চড়াই - য়ের মনে হয়, একমাত্র সেই বোধহয় ছিল বাবার কাছে সব সম্পর্কের উধে।

—বলছিলাম, ব্যাগটা যদি এবার একটু ফেরৎ দেওয়া যায়, বিশেষ উপকৃত হই।

ছি: ছি:। সে এতক্ষণ ছেলেটার ব্যাগটা বুকে চেপে চোখ বন্ধ করে এসব ভাবছিল। সকাল থেকে আজ এতবার তাল কাটছে কেন বুঝতে পারছিল না চড়াই। জ্বরটা বোধহয় বেড়েই চলেছে, এতটা অন্যমনস্ক যে নয়। ব্যাগটা তাড়াতাড়ি ফেরৎ দিয়ে সে দেখল পাশের ছেলেটি ছাড়া আশপাশের প্রায় সবাই তার দিকে অদ্ভুতভাবে চেয়ে আছে। কারণটা বুঝতে কয়েক মূহুর্ত লাগল তার, গাল বেয়ে চোখে জলটা অসভ্যের মতো গড়িয়ে পড়ছে। রুমাল দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুছে, সে আড়চোখে পশে তাকাল। নির্বিকার ছেলেটা এবার চোখ বন্ধ করে গুনগুন করে গান ধরেছে, গলাটা খারাপ না, গানটা চড়ায়ের খুব চেনা, বাবা খুব ভালোবাসত, চোখটা আবার বেয়াড়া হয়ে জল ফেলে দিতে পারে, তাই ইচ্ছে করেই চড়াই কথাটা জিজ্ঞেস করল—

— ট্রেনটা ছাড়ছে না কেন বলুন তো? কিছু হয়েছে? চোখ বন্ধ করেই উত্তর দিল ছেলেটা—

সৃষ্টিসন্ধান

— অবরোধ আছে।

— অবরোধ? কেন? উফ্। ঝামেলার শেষ নেই।

— ঝামেলার কী আছে? যখন ছাড়বে তখন সবার মতো আপনিও যাবেন।

— আমার যে খুব তাড়া আছে। ভীষণ দরকার।

— কার নেই? সবার তাড়া আছে।

চড়াই কথা না বাড়িয়ে, বাইরের দিকে চেয়ে রইল। সকালে এক গ্লাস দুধ আর দুটো বিস্কুট খেয়ে বেরিয়েছে। পেটে এখন ছুঁচোয় কুস্তি করছে। দীর্ঘসময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে ঝালমুড়িওয়ালারা বেশ লাভ করছে। চড়াইও অগত্যা ঝালমুড়ি কিনল। আগের ঘটে যাওয়া বিশ্রী কান্ডগুলোর জন্যই মনে হচ্ছিল যদিও ছেলেটিকে অফার করলে নিশ্চয়ই বেয়াড়া দেখাবে, তবু বোধহয় করা উচিত। কী করবে ভেবে না পেয়ে ঠোঙাটা হাতে নিয়েই বসে থাকল।

— চা- কফিও বিক্রী হচ্ছে প্রচুর। ওটা খেয়ে বরং একটা চা খেলে আপনার ভালো হয়।

— মানে?

— মানে চা খেলে শরীর মন ঝরঝরে হয়ে যায়।

— ঝরঝরে হলে সেটা না খাওয়াই ভালো।

— বা: ! চমৎকার!

— এতে চমৎকারের কী আছে?

— এই যে আমার ঝরঝরে শব্দটাকে আপনি বেশ নেগেটিভ সেন্সে অপূর্ব ব্যবহার করলেন।

চড়াই হেসে ফেলল। ছেলেটি হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—

—আপনি তো বাসমনি হাজরা, না?

চড়াই নিজে এমন বিদঘুটে নাম শুনে একটু খাবড়েই গেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই বলে ওঠল—

—আপনি বিবাদী বাগ, তাই তো?

— ঠিক ধরেছেন!

বলেই ছেলেটি হেসে উঠল। চড়াই এত সুন্দর হাসি এর আগে একজনেরই দেখেছে— বাবার! লোকজন হাঁ করে ওদের কথা গিলছে। অস্বস্তি হলেও মজা লাগছিল চড়াইয়ের। আজ সকাল থেকে যখন এতবার তাল কাটছে। তবে কাটুক। ছেলেটি ফিসফিস করে বলল—

—ইচ্ছে করলে কথা বলে যান। দর্শক শ্রোতাদের ওই একঘেয়ে বসে থাকায় কিছু তো রশদ মিলবে!

চড়াইয়ের মোবাইল বাজছে। কলি ফোন করেছে—

—হ্যালো, হ্যাঁ শোন ট্রেনের গন্ডগোলে আটকে আছি। নতুন পন্ডিতের ক্লাস নোটগুলো একটু দিস প্লিজ।

— কী বললি? হয়নি? প্রথম দিনই গাপ্পি। বা: !

—রাখছি রে! কখন পৌঁছব জানি না। ডি.জি.র সাজেশানটা আমার জন্য একটা এক্সট্রা জেরক্স করাস। ফোন রেখে দিল চড়াই। অসহ্য লাগে তার এই যন্ত্রটা। মা জোর করে ধরিয়েছে। সুইচ অফ করে দিয়ে ওটাকে ব্যাগে চালান করে দিল। বিবাদী আবার গান ধরেছে। এগানটাও মেঘ নিয়ে। বাবা ছোটোবেলায় সবসময় তাকে মেঘের দেশের রূপকথা শোনাতো। আর বাবা চলেও গেল সেখানে। চড়াইয়ের কখনও কিছু ভালো লাগলে— অন্যরকম লাগলে, এখনও মনে হয় বাবাই যেন মেঘের দেশের রূপকথা থেকে তাকে পাঠিয়েছে। এই গানটাও চড়াইয়ের চেনা। ছেলেটা তখন থেকে এই গানগুলোই গাইছে কেন রে বাবা! চড়াইকে যে ছোটোবেলার মেঘগুলো ঘিরে ধরছে বারবার। এবারও যদি বৃষ্টি শুরু হয়।

হাঁচকা মেরে ট্রেনটা ছাড়ল। বেশ স্পিড নিয়েছে। শ্রীরামপুরের পর একদম হাওড়া থামবে। ছেলেটা এবার গলা তুলেই গাইছে—" ...অঅকাশ বলে কূল মিশেছে, আমি তো আর নাই।"

বাবা মারা যাওয়ার দিন, শুতে যাওয়ার আগে এই গানটাই শুনছিল, আজ কেন যে এরকম হচ্ছে। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে চড়াই কাঁদতে পারেনি। তার ভয় করত, ভয় করে— সে কাঁদলে তো বৃষ্টি হবে, মেঘ থাকবে না আর মেঘ না থাকলে বাবাও থাকবে না। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে আটকালো চড়াই।

ট্রেন হাওড়া ঢুকে গেছে। লোকজন ভীষণ তাড়ায় ধেয়ে যাচ্ছে ড্রেনের দরজার দিকে। এতক্ষণ এই তাড়া যে কোথায় ছিল? চড়াই তার প্রায় অসাড় পা আর জ্বরে বিবশ শরীরটাকে নিয়ে কী করবে ভাবছিল। কেন যেন সকালের তাড়াহুড়ো করার ইচ্ছেটাই তার আর কাজ করছিল না। বিবাদীর কথায় সম্বিত ফিরল—

—একটু পরে নামা যাক, কেমন?

— কেন? আর আমি কখন নামব না নামব...

কথাটার শেষ হবার আগেই বিবাদী চমকে দিল তাকে। ছেলেটার হাতে তার আইকার্ড। চড়াইয়েরই দিকে দিয়ে বলল

— তখন ওটা আমার পায়ের কাছে পড়ে গেছিল। তাই হয়ত নজরে পড়েনি। বলাকা রায়, ইংলিশ অনার্স৩, থার্ড ইয়ার, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি।

— এটাকে বোধহয় পুরোপুরি ভদ্রতা বলা যায় না।

— তা, হয়তো যায় না। কিন্তু যখন কার্ডটা পেলাম তখন যার কার্ড সে নেওয়ার অবস্থায় ছিল না বোধহয়। তাছাড়া...

চড়াই রুক্ষ স্বরে বলে ওঠল,

— তাছাড়া কী?

— তাছাড়া... কিছু না।

ছেলেটা বেহায়ার মতো হাসছে। তবু চড়াই য়ের বাবার কথা মনে পড়ছে। চড়াই দেখল তার কিট্ ব্যাগটাও নামিয়ে দিল ছেলেটা। চড়াই ওটার চেষ্টা করছিল, কোনো রকমে দাঁড়াল। ছেলেটা ট্রেনের গেটের কছে গিয়ে কী যেন দেখল। তারপরেই ফিরে এসে কেমন যেন স্বরে বলল,

— 'নতুন পন্ডিতের' কথাটা শোনো, তোমার যা অবস্থা তাতে 'গাপ্পি' দেওয়া 'পন্ডিতকে' ভরসা করে চলো... গন্তব্য যখন একই।

চড়াইয়ের মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। বাবার মেঘের দেশ থেকে পাঠানো সেই 'অন্যরকম ভাললাগাটা' যে ঘিরে ফেলেছে তাকে। চারপাশে ভীষণ মেঘ করেছে যে! বৃষ্টিটা কী আর থামাতে পারবে চড়াই?

সৃষ্টিসন্ধান